গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ-১৪ সংখ্যা-১ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৭ WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৫ টাকা

ভড়ুই পাখির ধুলো-স্নান

ছবি : সম্রাট সরকার

❑ ভড়ুই-এর ধুলো স্নান ১১ ❑ রোবোট সার্জেন ২ ❑ এক অদৃশ্য আলোক ৪ ❑ অঙ্ক ৬ ❑ বহু মোচা-যুক্ত কলাগাছ ৭ ❑ ধারাবাহিক : ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৮ ❑ কুসংস্কার ৯ ❑ স্বাস্থ্য ১০ ❑ অলৌকিক নয় লৌকিক ১৩ ❑ সংবাদ ১২ ❑ মহাকাশ ১৪ ❑ জানো কি?/কবিতা/কার্টুন ১৬

রোবোট সার্জেন ও রসায়নে নোবেল প্রাইজ

ডঃ অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

১৯৫৯ সাল। ক্যালিফোর্নিয়া ইন্‌স্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে অ্যামেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির মিটিং-এ বক্তব্য রাখছেন পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান। অসম্ভব মেধাবী এই বিজ্ঞানী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নাটকীয় উপস্থাপনায় Plenty of Room at the Bottom এই শিরোনামে যে বক্তব্য সেদিন তিনি রেখেছিলেন তাঁকে অনেকেই ন্যানোটেকনোলজির ধারণাগত ভিত্তি বলে মনে করেন। ন্যানো-রোবোটিক সার্জারি ও লোকালাইজড ড্রাগ ডেলিভারির মত দুটি বিষয়ে তিনি আনবিক যন্ত্র বা মলিকিউলার মেশিনের সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগের কথা পূর্বানুমান করেছিলেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে ফাইনম্যান বলেন ‘‘যদিও এটা ভীষণ খ্যাপাটে ধারণা, তবে শল্যচিকিৎসায় এর ব্যবহার আকর্ষণীয় হতে পারে যদি আপনি শল্যচিকিৎসককেই গিলে খেয়ে নিতে পারেন। যন্ত্র-চিকিৎসককে আপনি আপনার রক্তনালীতে প্রবেশ করালেন। সেটি খুব সহজেই আপনার হৃদযন্ত্রে পৌঁছে যাবে আর চারদিকে তাকাবে। খুঁজে বের করবে হৃদযন্ত্রের ঠিক কোন ভাল্‌বটিতে গন্ডগোল আছে। তারপর একটি ছোট্ট ছুরি বের করে সেই জায়গাটি মেরামত করে দেবে।’’ তাঁর এই বক্তব্য থেকে হলিউডের সিনেমাওয়ালারা এক নতুন কল্পবিজ্ঞানের গল্পের রসদ খুঁজে পেয়েছিলেন। যার চলচ্চিত্রায়ন আমরা দেখি Fantastic Voyage নামে ১৯৬৬ সালের এক সিনেমায়, যেখানে এক সাবমেরিন-নাবিকের ক্ষুদ্র সংস্করণ

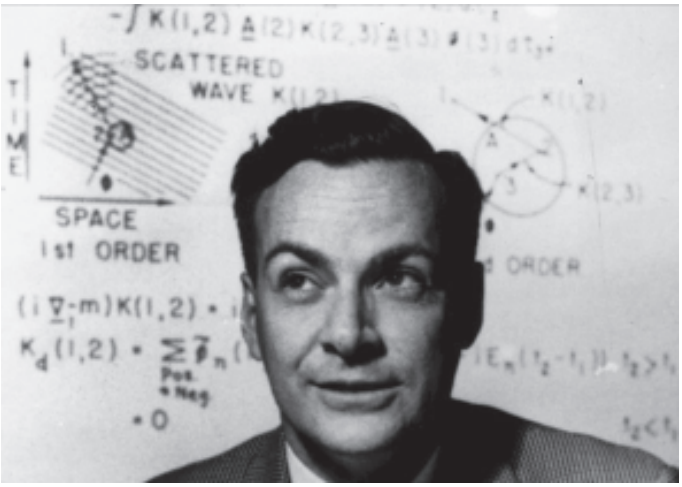

রিচার্ড ফাইনম্যান

বিজ্ঞানীর দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, তাকে রক্ষা করার জন্য।

জীবদেহের নানারকম জৈব প্রক্রিয়ায় আণবিক যন্ত্রের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। দেহকোষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন আণবিক যন্ত্রের মত আচরণ করে। পেশী সংকোচনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মোটর-প্রোটিন মায়োসিন এই রকমই একটি জটিল আণবিক যন্ত্র। তবে জীবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আণবিক যন্ত্র সম্ভবতঃ রাইবোজোম, যা প্রোটিন সংশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে বিজ্ঞানীরা বেশি আগ্রহী সংশ্লেষিত (Synthetic) আণবিক যন্ত্র নিয়ে, যা তাদের নির্দেশানুযায়ী কাজ করতে সক্ষম। কাজের প্রকারভেদ অনুযায়ী আণবিক সুইচ (Molecular switch), আণবিক চিমটা (Molecular tweezer), আণবিক শাটল (Molecular shuttle), আণবিক যুক্তি-দ্বার (Molecular logic gate) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আণবিক যন্ত্র হতে পারে।

প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে বিজ্ঞানী ফাইনম্যান যে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র যন্ত্রের কল্পনা করেছিলেন আধুনিক রসায়নবিদগণ ইতিমধ্যেই তার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপনে সফল হয়েছেন। এই সাফল্যকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন নোবেল পুরস্কার কমিটি। ফ্রেজার স্টোডার্ট-এর সাথে ২০১৬ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন জ্যাঁ-পিয়ের স্যুভেজ এবং বেন ফেরিঙ্গা।

চেষ্টা চলছিল কিন্তু সেই ষাটের দশক থেকেই। বলয়াকার (ring shaped) বিভিন্ন অণুকে পর পর জুড়ে শৃঙ্খলাকার অণু তৈরি করলেও আণবিক যন্ত্রের জটিল কার্যকলাপ পরীক্ষা করতে সেগুলো সমর্থ ছিল না। অবশেষে ১৯৮৩-তে জ্যাঁ-পিয়ের স্যুভেজের নেতৃত্বে একদল ফরাসী গবেষক কিছুটা সাফল্য পেলেন। একটি কেন্দ্রীয় কপার আয়নকে ঘিরে দুটি অণু এমনভাবে তাঁরা জুড়ে দিলেন যাতে করে শৃঙ্খলের প্রথম অংশ তৈরি হল। স্যুভেজের এই পদ্ধতিকেই আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন ফ্রেজার স্টোডার্ট। তিনি এক ন্যানো-স্কেল রড বানালেন ও তাতে একটি বলয়াকার অণু গলিয়ে দিলেন। ইলেকট্রন আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই বলয়াকার অণুটি ন্যানো-স্কেল রডের দুই প্রান্তের মাঝে সামনে-পেছনে চলাচল করতে পারে। তাঁর সহকারীদের বানানো এই ধরনের অণুকে ‘‘রোটাক্সেন’’ নামে ডাকা হয় যা আণবিক যন্ত্র তৈরির প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এভাবে বানানো রোটাক্সেন যেন একটি ক্ষুদ্র কৃত্রিম পেশী যা পাতলা সোনার তৈরি স্তরকে ভূমি থেকে ০.৭ ন্যানোমিটার উপরে তুলতে সক্ষম। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জিম হিথ-এর সঙ্গে যৌথ গবেষণায় এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফ্রেজার এমন একটি কম্পিউটার চিপস্ বানিয়েছেন যাতে মলিকিউলার সার্কিট ব্যবহার করা হয়েছে।

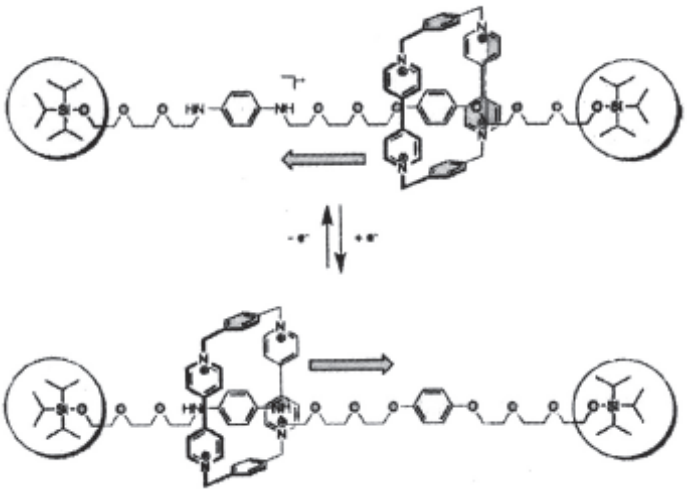

স্টোডার্টের দলের তৈরি তড়িৎ-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোটাক্সেনের চলন

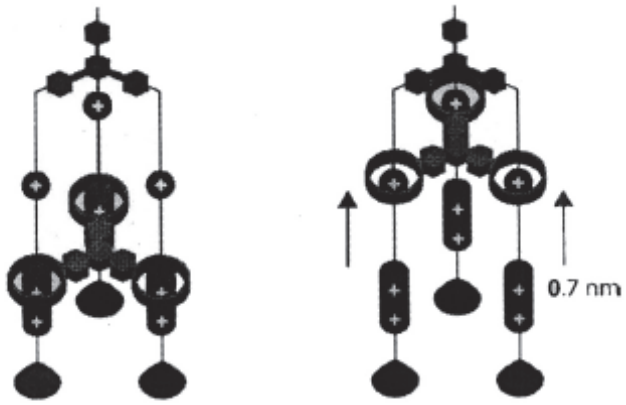

রোটাক্সেন নির্ভর আণবিক "এলিভেটর"

তবে নোবেলজয়ী তৃতীয় ব্যক্তি বেন ফেরিঙ্গার সাফল্য বিজ্ঞানের এই শাখায় যুগান্তকারী হিসাবে গণ্য হতে পারে। সাধারণভাবে যেকোনো অণুর গতি অনেকগুলি সম্ভাবনার ফল হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। ধরা যাক ঘূর্ণন গতির কথা। কোনো অণুর ক্ষেত্রে ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে এই দুই প্রকার গতির সম্ভাবনাই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ১৯৯৯ সালে ফেরিঙ্গা ও তার সহকারীরা কতগুলি বুদ্ধিদীপ্ত আণবিক কৌশল ব্যবহার করে এমন একটি অণু ডিজাইন করলেন যার ঘূর্ণন হবে কেবল একটি নির্দিষ্ট দিকেই। আর ২০১১-তে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ওরা বানিয়ে ফেললেন চার চাকার এক ন্যানোগাড়ি, যেখানে একটি আণবিক কাঠামোর সাথে চারটি আণবিক মোটর যুক্ত। এই আণবিক মোটরগুলোই গাড়ির চাকা হিসাবে কাজ করে।

গত কয়েক দশক ধরে বেশ কয়েকজন মেধাবী গবেষকের হাত ধরে পৃথিবীর নানা প্রান্তের গবেষণাগারে বিজ্ঞানের এই শাখা প্রভূত সাফল্যের সাক্ষর রেখেছে। ২০১৩ সালে ডেভিড লেই-এর নেতৃত্বে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এমন এক ন্যানো-রোবোট বানাতে সক্ষম হয়েছেন যা অ্যামিনো অ্যাসিডকে আঁকড়ে ধরতে পারে। আর এই অ্যাসিডই তো প্রোটিনের গঠন একক। প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডকে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় যুক্ত করে এই ন্যানো-রোবোট ঠিক সেই কাজটিই করে যা রাইবোজোম বিভিন্ন কোষে করে থাকে। আধুনিক গবেষকদের গবেষণাগার-ঋদ্ধ এইসব প্রযুক্তির সম্ভাব্য প্রয়োগ হয়তো বাস্তব পৃথিবীতে একদিন যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

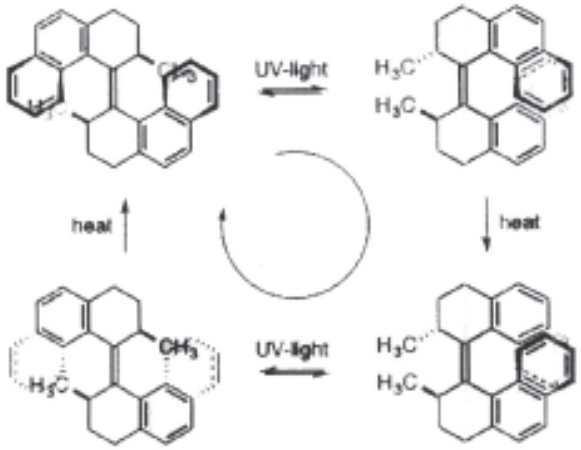

ফেরিঙ্গার বানানো আলো-চালিত "মলিকিউলার মোটর"

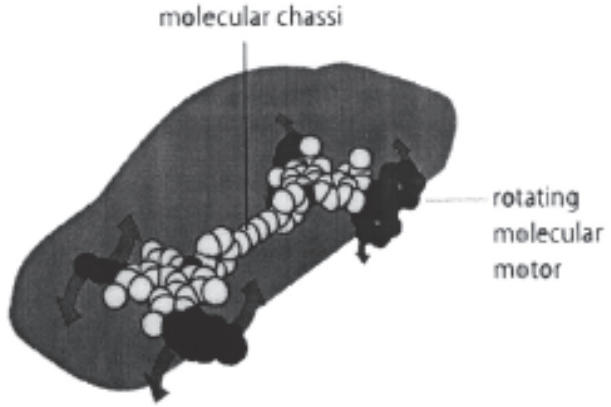

শিল্পীর কল্পনায় ফেরিঙ্গার চার-চাকা চালিত "ন্যানোগাড়ি"

E-mail : acnbu13@gmail.com ● M. 9434377067

এক অদৃশ্য আলোক

গোবিন্দ দাস

১৮৯৫ সালের ৮ই নভেম্বর। অস্তগামী সূর্যের আলোয় লালাভ পশ্চিম দিগন্ত। হিমেল বাতাস চারদিকে। অন্ধকার গবেষণাগারে গবেষণায় মগ্ন রন্ট্‌জেন। জার্মান পদার্থবিদ্ উইলহেম কনরাড রন্ট্‌জেন। তিনি ব্যস্ত ছিলেন একটি হিট্রোফ টিউব চালানোর কাজে। টিউবটির পুরোটাই ছিল কালো কার্ডবোর্ড দিয়ে ঢাকা। টিউবটির কাছে টাঙানো ছিল একটি পর্দা। পর্দাটি বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড মাখানো। হঠাৎ-ই রন্ট্‌জেন লক্ষ করলেন, পর্দাটিতে প্রতিপ্রভার সৃষ্টি হয়ে আলো বেরোচ্ছে। কী ব্যাপার! এক অদ্ভুত বিস্ময়ে নিক্ষিপ্ত হলেন বিজ্ঞানী। ভাবতে লাগলেন, নিশ্চয়ই পর্দার ওপর কোনও কিছু আঘাত করছে। কিসের আঘাত? সেই দিকটাকে ঘুরিয়ে দিলেন পর্দার দিকে। প্রতিপ্রভা দেখা গেল। পর্দাটিকে দূরে সরিয়ে, টিউবের কাছে এনে, পর্দা ও টিউবের মাঝে নানা বস্তু রেখে; পরীক্ষাটি করলেন। কী আশ্চর্য! একই ফল, একই ঘটনা। টিউব ও পর্দার মধ্যে এবার নিজের হাত রাখলেন। পর্দার ওপর হাতের হাড়ের ছবি ভেসে উঠলো। এ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগৎ পেল এক অমূল্য আবিষ্কার। রন্ট্‌জেন তখনও ভেবে উঠতে পারেন নি যে, তাঁর এই আবিষ্কার মানব কল্যাণে কি ব্যাপকভাবে কাজে আসবে। অবশ্য সেই মুহূর্তে এতদূর না ভাবতে পারাটাই স্বাভাবিক। গবেষণাগারে রন্ট্‌জেন একাই কাজ করতেন।

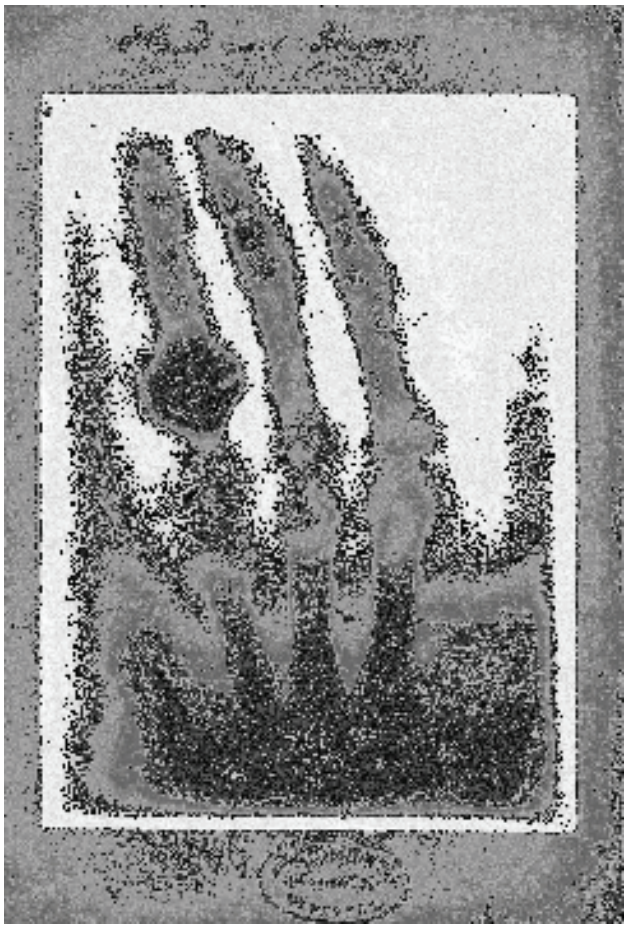

প্রথম এক্স রে ছবি

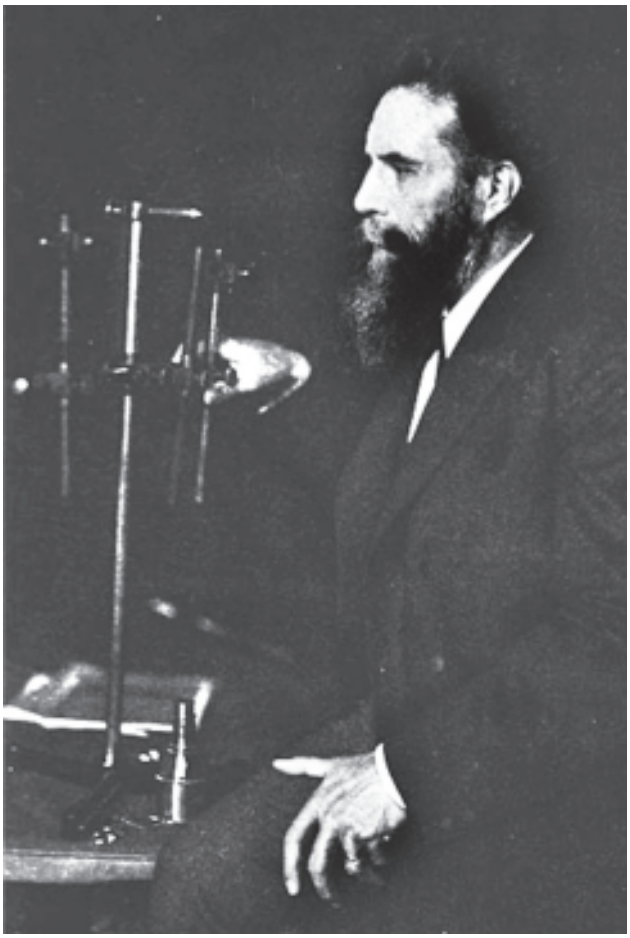

গবেষণাগারে রন্ট্‌জেন

টিউবটি তো কালো কার্ডবোর্ড ঢাকা, টিউবটি থেকে কোনও আলো বা ক্যাথোড রশ্মিও তো বেরিয়ে আসার কথা নয়। বিস্মিত রন্ট্‌জেন কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে যান। কী করবেন যেন ভেবে উঠতে পারছেন না। পর্দার যে দিকটাতে বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়ানাইড মাখানো নেই, কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি একাই নানাভাবে পরীক্ষাটি করে চললেন। তিনি আরও লক্ষ করলেন, বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন মাত্রায় তার নতুন রশ্মিতে স্বচ্ছ। ফোটোগ্রাফিক প্লেটে ছবি তুলে নিজের আবিষ্কার সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। ১৮৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে ভৌত

চিকিৎসা সোসাইটির সম্পাদকের কাছে তিনি তাঁর আবিষ্কারের একটি প্রাথমিক রিপোর্ট দাখিল করলেন। রিপোর্টে রন্ট্‌জেন বললেন, If we pass the discharge from a large Rumkorff coil through Hittrof or a sufficiently exhausted Lennard, Crookes or similar apparatus and cover the tube with some what closely fitting mantle of their black cardboard, we observe in a completely dark room that a paper screen covered with barium platino cynide lights up brilliantly and fluoresces equally well whether the treated side or the other be turned towards the discharge tube. রিপোর্টটি ছাপা হল। ১৮৯৬ সালের জানুয়ারি মাসের গোড়ায় রিপোর্টটি পৌঁছে গেল অনেকের কাছে। রন্ট্‌জেন এই নতুন রশ্মির নাম দিলেন X-ray (এক্স রশ্মি)। ১৯৯৬ সালের ২৩ জানুয়ারি তারিখে এক প্রকাশ্য সমাবেশে রন্ট্‌জেন ঘোষণা করলেন তাঁর এক্স রশ্মি আবিষ্কারের কথা। বহু বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণাগারে এক্স রশ্মি উৎপাদনের ব্যাপারটি যাচাই করে দেখলেন। রন্ট্‌জেনের বক্তব্যের সমর্থন মিলল সকল ক্ষেত্রেই। পদার্থবিদ্যায় প্রথম নোবেল পুরস্কারটি পৌঁছল রন্ট্‌জেনের কাছে ১৯০১ সালে।

এক্স রশ্মির আবিষ্কার, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের ঘটনা। বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর জন্মলগ্নের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলির মধ্যে এক্স রশ্মির আবিষ্কার অন্যতম। তাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিগত সব দিক দিয়েই অগ্রগতির অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমুজ্জ্বল এই শতাব্দী। বিরাট সব ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেকখানি। মানব সভ্যতার কল্যাণে সরাসরি কাজে লেগেছে কোনো কোনো আবিষ্কার, আবার কোনো আবিষ্কার মানব কল্যাণে কাজে লেগেছে পরোক্ষভাবে। কোনো আবিষ্কারের সুফল পাওয়া গেছে আবিষ্কারের অল্প দিনের মধ্যেই, আবার কোনো ক্ষেত্রে সুফল পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে বহুদিন। এক্স রশ্মি ওই প্রথম শ্রেণিটির মধ্যে পড়ে।

এক্স রশ্মি আসলে কি? ঠিক কিভাবে তৈরী হয় এক্স রশ্মি? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি বিজ্ঞানী রন্ট্‌জেন। প্রায় ষোল বছর কেটে গেছে এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে। এ ব্যাপারে সফল বিজ্ঞানীরা হলেন ম্যাক্স ফন লাওয়া, পি আগার, মোজ্‌লে প্রমুখ। এঁদের কাজে বোঝা গেল, এক্স রশ্মির আচার ব্যবহার অনেকাংশে আলোর রশ্মির মতই, যদিও গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্যও আছে। সেই পার্থক্যের কারণ নিহিত আছে তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্যে। এক্স রশ্মি যে তরঙ্গমালায় গঠিত, তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মোটামুটিভাবে ০.১ থেকে ১০০ অ্যাংস্ট্রমের মধ্যে। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় এক্স রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুবই কম, প্রায় ১০০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। দৃশ্যমান আলোর মতই এক্স রশ্মি এক ধরনের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। এক্স রশ্মির ক্ষেত্রেও প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, সমবর্তন ইত্যাদি তরঙ্গধর্ম পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।

আবিষ্কারের সময় থেকেই এক্স রশ্মি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে এবং রোগের নিরাময়ে এক্স রশ্মি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এক্স রশ্মি দেহের মাংস ভেদ করতে পারে, কিন্তু হাড় ভেদ করতে পারে না। এক্স রশ্মি ফোটোগ্রাফিক প্লেটকে প্রভাবিত করতে পারে। এই দুই ধর্মের প্রয়োগে দেহের ভিতরের বিভিন্ন অংশের রেডিয়োগ্রাফ করতে এক্স রশ্মি ব্যবহার করা হয়। দেহের কোনো অংশের হাড় ভেঙে গেলে ভাঙা হাড়ের অবস্থান, দেহের ভিতরে কোনো অবাঞ্ছিত বস্তু থাকলে তার অস্তিত্ব, কিডনি বা গলব্লাডারে পাথর (?) হলে তার অস্বিত্ব, আলসার বা টিউমারের অস্তিত্ব জানার জন্য এক্স রশ্মি ব্যবহার করা হয়। এক্স রশ্মি জীবিত কোষকে ধ্বংস করে এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে এক্স রশ্মির সাহায্যে টিউমার, চর্মরোগ প্রভৃতির চিকিৎসা করা হয়। দাঁতের চিকিৎসাতেও এক্স রশ্মি ব্যবহার হচ্ছে।

কারিগরি বিজ্ঞানে এবং আধুনিক শিল্পে এক্স রশ্মির প্রয়োগ আছে। এক্স রশ্মির সাহায্যে ঢালাই করা ধাতু সামগ্রী, ছাঁচ, ঝালাই ইত্যাদির ত্রুটি পরীক্ষা করা হয়। উপরন্তু, উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীতে সূক্ষ্ম চিড় ইত্যাদি দোষত্রুটির অস্তিত্ব নির্ধারণেও এক্স রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

দেহের ভেতরে নিষিদ্ধ বস্তু বা দামী রত্ন ইত্যাদি লুকিয়ে রাখলে এক্স রশ্মির সাহায্যে তা সহজেই ধরা যায়। শুল্ক বিভাগে এবং গোয়েন্দা বিভাগে তদন্তের কাজে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এভাবে এক্স রশ্মি ব্যবহার হয়।

কেলাসের গঠন সংক্রান্ত পরীক্ষা, অণু এবং পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত গবেষণায় এক্স রশ্মি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে এক্স রশ্মি ব্যবহারের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। মহাকাশ থেকে আসা এক্স রশ্মি সংক্রান্ত বিষয়গুলি এক্স-রে অ্যাস্ট্রোনমির বিশাল প্রাসাদ তৈরি করেছে।

মানব কল্যাণে এক্স রশ্মির ব্যবহারের নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত হচ্ছে। সাধ্যমত সেসব জেনে নেব আমরা।

E-mail : gcd.cos.1729@gmail.com • M. 8420040852

বিজ্ঞান অন্বেষক এখন থেকে নতুন চেহারায়। পৃষ্ঠা সংখ্যাও দ্বিগুণ করা হল। পত্রিকার বিনিময় মূল্য কিছুটা বাড়াতে বাধ্য হলাম। আশাকরি পাঠকের সহযোগিতা পাব।

পরিচালকমণ্ডলী

কোথায় ‘পাই’, অঙ্ক করে যাই

অঙ্কিতা সেনগুপ্ত

সৃষ্টির পথে নিরলস তার যাত্রা। কবে থেকে শুরু, কোথায় শেষ তা জানা নেই। তাকে ঘিরে অনেক রহস্য, আকর্ষণ, কৌতূহল। এতটাই গুরুত্বপূর্ণ সে, যে আমাদের হাতে গোনা ৩৬৫ দিনের একটি তার নামে নামাঙ্কিত। কে সে? বলা উচিত, ‘কি সে?’ সে হলো π (পাই)। কোনো বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে চিহ্নিত করা হয় গ্রিক বর্ণমালার এই ১৬তম বর্ণটি দিয়ে।

π = বৃত্তের পরিধি/বৃত্তের ব্যাস

ছোটবেলায় $\pi = 22/7$ ধরে পরিমিতির অঙ্ক তো সব মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকেই করতে হয়েছে, ভাল লাগুক বা না লাগুক। অথচ কখন মনে হয়েছে, আপাদমস্তক নিরীহ এই বর্ণটি জীবশ্রেষ্ঠ মানবকে কত যুগ ধরে ভাবিয়েছে এবং এখনও ভাবাচ্ছে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার, যদিও π চিহ্নটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন উইলিয়াম জোন্স, কিন্তু বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতের চর্চা সুপ্রাচীন। হবে নাই বা কেন, আমাদের চোখের তারা থেকে শুরু করে শঙ্কু, গোলক, পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য সবই তো বৃত্তেরই নির্মাণ। কবে থেকে এই অনুপাতের চর্চা হচ্ছে তা বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ঃ

1956 সালে হেনরী রাইন্ড একটি মিশরীয় লিপি কেনেন যা আনুমানিক 1650 খ্রিস্টপূর্বাব্দের। লিপিটিতে একটি উক্তি পাওয়া যায়—যে বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য 8 তার ক্ষেত্রফল সেই বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান যার ব্যাস 9। এর থেকেই বোঝা যায় যে π-এর অনুসন্ধান কবে থেকে হয়ে আসছে। প্রাচীন ব্যাবিলনীয়, গ্রিক সভ্যতাতেও এই অনুসন্ধানের উদাহরণ পাওয়া যায়।

এখানে একটা প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক যে $\pi = 22/7$ জানার জন্য এত চর্চার কি দরকার? মজার কথা এটাই যে π-এর মান 22/7 নয়ই, অঙ্কের সুবিধার জন্য $\pi = 22/7$ বা 3.14 ধরে নেওয়া হয়। এটি কোন মূলদ সংখ্যাই নয়। তাই তো সেই কোন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ চেষ্টা করে যাচ্ছে দশমিকের পর যতগুলো সম্ভব ততগুলো ঘর (digit) পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয় করতে। π-এর প্রথম 26টি digit হল ঃ 3.14159265358979323846264 33

বোঝা যাচ্ছে দশমিকের পর কোনও একটি সংখ্যা বা সংখ্যার pattern পুনরাবৃত্ত হচ্ছে না। তাই π না হল পূর্ণসংখ্যা, না হল সসীম দশমিক সংখ্যা, না হল আবৃত্ত দশমিক সংখ্যা। তার ঠাঁই হল অমূলদ সংখ্যার দলে এবং তাকে সর্বপ্রথম এই দলের সদস্য করেন জোহান ল্যাম্বার্ট।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সংখ্যাটির চর্চা প্রাচীন ভারতেও কম হয়নি। আর্যভট্টের একটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করলে যা দাঁড়ায় তা হল ঃ

4 এর সাথে 100 যোগ করে প্রাপ্ত সংখ্যাকে 8 দিয়ে গুণ করে যে গুণফল পাওয়া যায় তার সাথে 62000 যোগ করলে প্রাপ্ত যোগফল সেই বৃত্তের পরিধির প্রায় সমান হবে যার ব্যাস 20000।

অর্থাৎ $\{(4+100)\times 8+62000\}/20000 = 3.1416$

ভাবলেও অবাক হতে হয় যে খ্রিস্ট জন্মের পাঁচশ বছর আগে কিভাবে এক ভারতীয় বিজ্ঞানী π-এর চার দশমিক স্থান পর্যন্ত মান নির্ণয় করেছিলেন, আর তার প্রায় 2500 বছর পর আরেক ভারতীয় গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজন এমন একটি সূত্র আবিষ্কার করেন যা আজও computer-এ π-এর মান নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়।

π-এর এই অনন্ত রহস্যের পথে হেঁটেছেন কত গণিতজ্ঞ— আর্কিমিডিস, ফিবোনাকি, নিউটন, ফোরিয়ার, আলকাশি, বেলার্ড—দীর্ঘ সে নামের তালিকা। আজ এই আধুনিক পৃথিবীও π-এর আকর্ষণ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেনি। 1949 সালে সর্বপ্রথম ইনিয়াক সুপার কম্পিউটার দশমিকের পর 2032 ঘর পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয় করে। NASA ও অন্যান্য মহাজাগতিক গবেষণাগারে এর মান দশমিকের পর 39 ঘর পর্যন্ত ধরা হয়।

শুধু কি গণিতের জগৎ, π স্থান পেয়েছে কবিতা, গল্প এমনকি চলচ্চিত্র জগতেও। Star Trek সিনেমাটিতে একটি কম্পিউটার ধ্বংস করা হয় তাকে π-এর সর্বশেষ digit গণনা করার আদেশ দিয়ে।

তাই তো প্রতি বছর 14ই মার্চ-কে ‘পাই দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। এই দিনটি আবার আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্মদিনও। 2016 সালের পাই দিবস 3.14.16 (mm/dd/yy) আবার নির্দেশ করে চার দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান।

যদিও বর্তমানে অত্যাধুনিক কম্পিউটার π-এর মান নির্ণয় করেছে 10 ট্রিলিয়ন দশমিক স্থান পর্যন্ত, তাও π নির্ণয়ের এই অভিযান আজও থামেনি এবং থামবেও না যতদিন মানবসভ্যতা থাকবে। এই অভিযানে কতদূর এগোন যাবে তার উত্তর লুকিয়ে আছে সময়ের গহ্বরে। এখন শুধু এইটুকুই জানা যে, $\pi = 22/7$ ধরে এতদিন অঙ্ক সমাধান করে মনে আনন্দ হয়েছে, তাদের কোনটাই সঠিক নয়, সঠিকের কাছাকাছি। কি অদ্ভুত, তাই না?

যোগাযোগ ঃ শিক্ষিকা, যোতশিবরামপুর গার্লস হাইস্কুল, মহেশতলা
E-mail : ankitasengupta57@gmail.com • M. 9748685280

বহু মোচা-যুক্ত কলাগাছ

ডঃ তুষার কান্তি নাথ

ঘটনা-১ ঃ চব্বিশ পরগনা জেলার অশোকনগর ব্লকের গিলেপোল গ্রামের ধানের মাঠের আলে বেড়ে ওঠা এক কাঁচা কলাগাছের (*Musa paradisiacal L.*) কাঁদিতে একটির পরিবর্তে অনেক মোচা বেরিয়েছে। কাঁদির যে জায়গা থেকে কলার ছড়া বেরনোর কথা সেখান থেকে তৈরি হওয়া দন্ডাকৃতি অংশে (পরিভাষায় যাকে বলে বিভাজিত *inflorescence rachis*) দেখা গেল এক বা একাধিক মোচা। সমগ্র কাঁদিটিতে মোচার সংখ্যা আঠাশটি। এ এক অদ্ভুত প্রকৃতির খেলা। স্থানীয় কিছু মানুষের চেষ্টায় তার ইতিমধ্যেই দেবত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। তবে কালবৈশাখির ঝড়ে গাছটি উৎপাটিত হওয়ায় যুক্তিবাদী মানুষেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেও গাছটিতে কয়টি কলা হয় এবং কলার আকার আকৃতিই বা কেমন হয় তা জানা গেল না।

ঘটনা-২ ঃ নদীয়া জেলার হরিণঘাটার কাষ্ঠডাঙ্গা অঞ্চলে আরও একটি এরকম উদাহরণ পাওয়া গেছে। ভোমরা বিলের পাশে নীচু ধানের জমি। জমির পাশে ছোট্ট একটি ডোবা। ডোবার ধারে অনাদরে বেড়ে ওঠা কিছু গাছ-গাছালির মধ্যে রয়েছে একটি বিশেষ কলাগাছ (*Musa paradisiacal L.* বীজ-কলা প্রজাতির)। বিশেষ, কারণ সে অন্যদের থেকে ভিন্ন। তার গর্ভে একই সাথে বেড়ে উঠছে আটচল্লিশটি সন্তান (পড়ুন 'মোচা')। তবে আগের ঘটনার সাথে এই ঘটনার কিছু প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে কলাগাছের মঞ্জরিদন্ডটি বেরিয়ে একদম অগ্রভাগে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। প্রতিটি ভাগ পুনরায় বিভাজিত হয়ে এক বা একাধিক মোচা ধারণ করেছে। এখন দেখার বিষয় কলার সংখ্যা এবং প্রকৃতি কেমন হয়।

সম্ভাব্য কারণ ও ব্যাখ্যা ঃ কলা গাছের পুষ্পমঞ্জরি হল প্যানিকুলেট বা মিশ্র স্প্যাডিক্স প্রকৃতির অর্থাৎ এক্ষেত্রে থোড়ের অগ্রভাগ মঞ্জরিদন্ড হিসাবে বেরিয়ে আসে এবং পুষ্প ধারণ করে। পুষ্পগুলি গুচ্ছাকারে মঞ্জরিদন্ডের নির্দিষ্ট কিছু জায়গা থেকে উদ্‌গত হয় এবং তা স্পেদ্ বা নৌকোকৃতি অংশ দ্বারা ঢাকা থাকে। কলার ছড়া ছাড়তে ছাড়তে মোচার ক্ষয়িত শেষাংশ মঞ্জরিদন্ডের অগ্রভাগে অবস্থান করে। এটাই সম্ভব।

কিন্তু প্রথম ঘটনার ক্ষেত্রে মঞ্জরিদন্ডের যে অংশ পুষ্প বের হওয়ার কথা সেখান থেকে মঞ্জরিদন্ডের শাখা উদ্‌গত হয়েছে। আমরা জানি, পুষ্প একপ্রকার পরিবর্তিত বিটপ। এক্ষেত্রে পুষ্প তৈরি হওয়ার সময় পরিবর্তন ছাড়াই বিটপ বা শাখা উৎপন্ন হয়েছে। এটি একপ্রকার বিকাশগত ত্রুটি। দ্বিতীয় ঘটনায়, অগ্রমুকুল থেকে মঞ্জরিদন্ডের বিকাশের সময় অগ্রমুকুলটি সম্ভবত কোন কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকতে পারে। তাই খন্ডিত অগ্রমুকুল থেকে একাধিক শাখা উৎপন্ন হয়েছে। প্রতিটি শাখা পুনরায় বিভাজিত হয়েছে এবং প্রতিটি বিভাজিত শাখা এক বা একাধিক মোচা ধারণ করেছে।

উপরিউক্ত কলাগাছ দুটি একই প্রকৃতিগত অবস্থায় (মাঠে জলযুক্ত জমির পাশে) এবং একই ঋতুতে বহু মোচা যুক্ত কাঁদি উৎপন্ন করেছে। তাই কোন আবহাওয়াগত বিষয়ও এই অস্বাভাবিকত্বের জন্য দায়ী থাকতে পারে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন। এবং তারপর...

গবেষণার মাধ্যমে যদি নিয়ন্ত্রিতভাবে বহু মোচা যুক্ত কলাগাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয় এবং কলার সংখ্যা ও প্রকৃতি যদি স্বাভাবিক থাকে তাহলে চাষিদের লাভের অঙ্ক কয়েক গুণ বাড়বে এবং কলা চাষে নব দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

E-mail : tushar_kly@rediffmail.com • M. 9434553582

পড়ুন ও পড়ান

১. যখন পৃথিবী বিপন্ন মূল্য	৬০্
২. স্বাস্থ্যের বৃত্তে	২০্
৩. স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন	৩০্
৪. এবং কি-কে ও কেন	১৫্

ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রাজদীপ ভট্টাচার্য্য

১৬৩৩ সাল। দেশ ইটালি, স্থান বিচার কক্ষ। বিচার চলছে সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর। অপরাধ বাইবেলে বর্ণিত ধারণার বিপরীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তিনি লিখেছেন যে পৃথিবীকে ঘিরে গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য সহ তাবৎ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের আবর্তন করে চলার প্রচলিত গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কল্পনা প্রসূত। পৃথিবী হল সৌরজগতে সূর্যকে ঘিরে প্রদক্ষিণরত একটি গ্রহ মাত্র। এভাবে বাইবেলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দায়ে আজ বৃদ্ধের হাতে শৃঙ্খল। চরম অত্যাচার-বঞ্চনার মুখে দাঁড়িয়েও আর মাথা নত করেননি তিনি। গৃহবন্দি হয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনের শেষের সেই দিনগুলি, যতদিন তাঁর দুর্বল চোখে আলো আর অন্ধকারের ফারাকটুকু ধরা পড়ত।

সত্যকে প্রতিষ্ঠার তাগিদে গ্যালিলিও গ্যালিলি'র মত এই মরজীবনকে ফুৎকারে অস্বীকার করেছেন এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কম নয়। এমনকি আমাদের কলকাতা শহরও সাক্ষী আছে এমনই একটি ঘটনার।

প্রথম টেস্ট টিউব বেবি— দুর্গা (কানুপ্রিয়া আগরওয়াল)

১৯৩১ সালের ১৬ই জানুয়ারি হাজারীবাগে জন্ম হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। পরবর্তী সময়ে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পড়াশুনা সমাপ্ত করে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ছাত্ররূপে যোগ দেন তিনি। ১৯৫৫ সালে গায়নোকোলজি বিভাগে প্রথম হয়ে হেমাঙ্গিনী স্কলারশিপ নিয়ে পাস করেন এম.বি.বি.এস.। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ শুরু হয় অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। রিপ্রোডাকটিভ ফিজিওলজি বিষয়ে পি.এইচ.ডি.'র কাজ শেষ হয় ১৯৫৮ সালে।

১৯৬০ সালে ডঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় নমিতা দেবীর সাথে। ইতিমধ্যে এন্ডোক্রিন ফিজিওলজি বিষয়ে পড়াশুনোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ইংলন্ডে। সেখানে Clinical Endocrinology Research Institute থেকে অধ্যাপক জন এ. লোরেনের সাথে হরমোন সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা ১৯৬৭ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে পি.এইচ.ডি. সম্মান এনে দেয়। ইঁদুর প্রভৃতি মনুষ্যেতর প্রাণীর উপর হরমোনের প্রভাব সংক্রান্ত তাঁর এই হাতে কলমে গবেষণা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তাঁকে আরো তীক্ষ্ণ ও উপযুক্ত করে তোলে। এডিনবরার Royal Infirmary-তেও তিনি এসময়ে কাজ করেছিলেন।

দেশে ফিরে কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে শিক্ষক রূপে যোগ দেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। hcg বা হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন হরমোন-এর উৎস, কার্যকারিতা, প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে চলতে থাকে গবেষণার কাজ। hcg এর উৎস সম্পর্কে নতুন দিকদর্শন করেন সুভাষবাবু। নারীদের ক্ষেত্রে প্রজননগত সমস্যায় টেস্টোস্টেরন হরমোনের প্রয়োগ বিষয়ে গবেষণা তাঁর মৌলিকতা প্রমাণ করে। ১৯৭৭ সালে প্যারিস শহরে আয়োজিত International Conference of Physiological Sciences-এ সুভাষ মুখোপাধ্যায় নারীদের প্রজননগত সমস্যার ক্ষেত্রে মানসিক চাপ ও অস্থিরতার গুরুত্ব বিষয়ে নিজের অমূল্য মতামত রাখেন। তখনকার দিনে এইরূপ ধারণা অনেকটাই অজানা থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষভাবে প্রমাণিত।

ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১৯৭৮ সালের ৩রা অক্টোবর মাসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন ক্রায়োবায়োলজিস্ট ডঃ সুনীত মুখোপাধ্যায় এবং গায়নোকোলজিস্ট ডঃ সরোজ কান্তি ভট্টাচার্য্যের সহযোগিতায় ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় কলকাতায় এশিয়ার প্রথম টেস্ট টিউব বেবি 'দুর্গা'র জন্মের কথা ঘোষণা করেন। মাত্র ৬৭ দিন পূর্বে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম টেস্ট টিউব বেবি লুইস জয় ব্রাউস-এর জন্মকথা ঘোষিত হয়েছে ইংলন্ডে। সেই গৌরব লাভ করেছে R. G. Edwards এবং Patric Steptoe। এমত সময়ে এশিয়া তথা ভারতবর্ষের প্রথম টেস্ট টিউব বেবির জন্মকথা ঘোষণা করলেন ডঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিস্ময়ে হতবাক হল বাংলা তথা ভারতবর্ষের চিকিৎসক সমাজ। সময়ের চেয়ে বহুদূর পথ এগিয়ে থাকা এই আবিষ্কারের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগল অনেকের মনে। এই নব্য চিকিৎসক-গবেষকের এহেন কীর্তিফলক স্থাপনের কথা মেনে নিতে গিয়ে কোথাও কোথাও পুঞ্জিভূত হল পেশাগত ঈর্ষা ও অসূয়া।

E-mail : rajdip5678@gmail.com ● M. 9836569850 *পরবর্তী অংশ পরের সংখ্যায়*

বৈজ্ঞানিক সংগঠন ‘ইসরো’র বিজ্ঞানীরাও কুসংস্কার মুক্ত নয়

তপন চন্দ

আদিম অলৌকিকতাবাদের অন্ধকার থেকে প্রাকৃতিক ও জৈবনিক সত্যকে মুক্ত করার জ্ঞান থেকেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। মহাকাশে বিচরণশীল গ্রহ-নক্ষত্ররাজি তথা অসংখ্য সৌরজগতের আবিষ্কার, পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব পরিমাপক আলোকবর্ষ ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলেই মানুষের মহাকাশ অভিযান সফল হচ্ছে। অতি সম্প্রতি যেমন সফল হয়েছে ‘ইসরো’ নির্মিত কৃত্রিম উপগ্রহ সহ মঙ্গলযান উৎক্ষেপণের দিন-সময় ঠিক করা হয়েছিল হিন্দু পঞ্জিকায় বর্ণিত শুভ দিনক্ষণ লগ্ন অনুসারে। উৎক্ষেপণের আগে মঙ্গল অভিযান সফল করার প্রার্থনায় ইসরো’র চেয়ারম্যান রাধাকৃষ্ণণ সপার্ষদ নৈবেদ্য সাজিয়ে তিরুপতি মন্দিরে পূজা দিয়েছেন। নৈবেদ্যর ডালিতে ছিল, মঙ্গলকে প্রদক্ষিণের জন্য নির্মিত উক্ত গ্রহের অতি ক্ষুদ্র মডেল। খ্রিস্টানরা ১৩ সংখ্যাটিকে অশুভ মনে করে বলে ‘ইসরো’ তাঁর ১২ তম অভিযানের পরবর্তী নম্বর ১৩ না দিয়ে, দিয়েছিল-১৪। কুসংস্কারবাদের আচ্ছন্নতাকে সমালোচনা করে বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা ইংরাজি দৈনিক স্টেটসম্যানের প্রিন্ট জার্নালিজম স্কুলের ডিরেক্টর সাম রাজাপ্পা জানিয়েছিল ‘ইসরোর মত একটি বৈজ্ঞানিক সংগঠনের অন্ধ বিশ্বাস-এর কোন স্থান থাকা উচিৎ নয়। সংবিধানের ৫১ ধারাতে বলা আছে, ‘ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হল বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবতাবাদ বিকশিত করা ও অনুসন্ধিৎসু ও সংস্কারমুখী হওয়ার’। অক্সফোর্ড ডিক্সনারি অনুযায়ী কুসংস্কারের বর্ণনা হল, ‘প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না এমন শক্তি বা এমন কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস, অজ্ঞাত বা রহস্যময় কিছুর অযৌক্তিক ভীতি।’ প্রসঙ্গত, উক্ত মঙ্গলযানটি উৎক্ষেপিত হয়েছে কেরালার জ্যোতিষীদের পরামর্শ মত ৫ই নভেম্বরে রাহুকাল, গুলিকাকাল ও থামাদককাল বাদ দিয়ে বেলা ২টা ১৮ মিনিটে। ইসরোর জন্য আকাশমুখী জানালা খোলা হয় শুভ দিনে ও লগ্ন অনুসারে। ইসরোর প্রধান কর্মকর্তা রাধাকৃষ্ণণ ও তার টিমের বিজ্ঞানীরা তিরুপতির ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে, নিকটস্থ কালাহস্তি মন্দিরে এবং আলারপেট আল্লামালাই মন্দিরে মহাকাশযানের মডেল নিবেদন করে পূজা না দেওয়া পর্যন্ত শ্রীহরি কোটা-র সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে কোন উৎক্ষেপণই হয় না। কুসংস্কারাবাদ তাদের ঘাড়ে চেপে থাকে। তাই ১৩ সংখ্যাটিকে তারা ভয় করেন। কুসংস্কার চিন্তা করার অনুমতি দেয় না, দাবী করে অন্ধবিশ্বাস। ইসরোকে যদি মহাকাশ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করতে হয় ও এগিয়ে যেতে হয়, তবে নিরর্থক রহস্যময়তার ও যাদু টোনার শিকার না হয়ে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার সৃষ্টি করতে হবে, অন্তত সিনিয়ারদের মধ্যে। বিজ্ঞানের প্রায়োগিক সফলতার কারণে জনসাধারণের মধ্যে অলৌকিকতাবাদের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাবার ফলে ধর্ম ব্যবসায়ীরা সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় নিষিক্ত ‘বিজ্ঞানী’দের দিয়ে প্রচার করায় যে বিজ্ঞানীরা অলৌকিকবাদ অস্বীকার করেন না। মহাকাশে মহাবিস্ফোরণ (বিগ ব্যাং) বিশ্ব-মহাবিশ্ব সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোকে গবেষণা লব্ধ মহাকাশের বিচরণশীল অগণিত কণাগুলির ভর প্রদানকারী হিগস-বোসন তাত্ত্বিক কণা সম্বন্ধীয় পুস্তকের নাম ‘ঈশ্বরকণা’ (গড পার্টিকাল) রাখার জন্য লেখককে বাধ্য করেছিল পুস্তকটির প্রকাশক, যা লেখক স্বীকার করেছেন। তাই হিগস-বোসন কণাটির অস্তিত্ব সার্নের প্রায়োগিক গবেষণার প্রমাণসিদ্ধ হওয়ার পর অনেকে ‘ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত’ বলে যে উল্লাসে মেতে উঠেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণের মধ্যে অলৌকিকবাদের প্রতি আস্থা রাখার জন্য যাদের মনে অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য এই আবিষ্কারকে ব্যবহার করা।

যোগাযোগ : পো: মাদারিহাট, জেলা : আলিপুরদুয়ার
E-mail : mr.tapan_chandarationalist.com • M. 9733153661

রাতের আনন্দের পর চির অন্ধকারে

ডাঃ শিবপ্রসাদ পাল

সেদিন সকালে হাসপাতালের আউটডোরে পেশেন্ট দেখছি। একটি ২০-২২ বছরের ছেলেকে দুজনে দু'হাত ধরে নিয়ে এসে আমার সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিল। স্বাস্থ্যবান যুবক। বিমর্ষ মুখ। এর কি এমন অসুবিধা হল যে ধরে আনতে হল। তবে কি দেখতে পাচ্ছে না। কেমন একটা বিষণ্ণভাব সবার মুখে। ভিতরের প্রশ্নগুলিকে বাইরে আনলাম।

—বলুন কি অসুবিধা?

—ডাক্তারবাবু ও একদম দেখতে পাচ্ছে না।

যুবকটির সঙ্গে আসা আত্মীয় বলল।

—কত দিন হল?

—সাত দিন।

—এর আগে দেখতে অসুবিধা ছিল না?

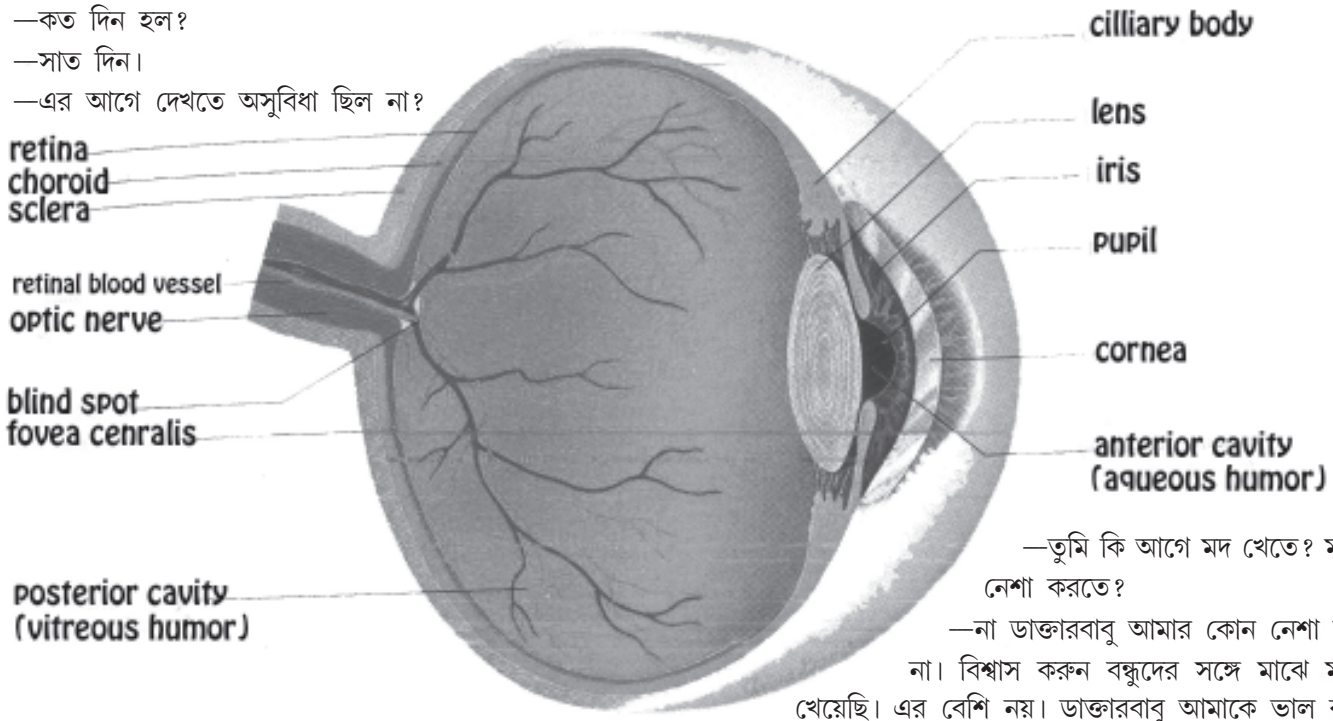

—না ডাক্তারবাবু আগে ঠিকই দেখত।

ওর হিস্ট্রি সিটে চোখ বোলালাম। অপটোমেট্রিস্ট ওর ভিশন এর জায়গায় লিখে রেখেছে N O P L অর্থাৎ No Perception of Light মানে চোখে আলো বুঝতে পারছে না।

পরীক্ষা শুরু করলাম। সত্যি ও আলো দেখতেও পারছে না। চোখের তারা দুটি আলোর উদ্দীপনায় সাড়া দিল না। তারার আলোয় সংকুচিত ও প্রসারিত হবার প্রবণতাই নেই। তারারন্ধ্র কিছুটা বর্ধিত অবস্থায় আছে।

বাইরের অংশে আর কিছু পেলাম না। কোন চোট আঘাতের চিহ্ন নেই। এবার ভিতরের পরীক্ষা। অপ্থ্যালমোসকোপ দিয়ে অপটিক নার্ভের অবস্থা পর্যবেক্ষণ। অপটিক নার্ভ চোখের প্রধান স্নায়ু যা রেটিনায় পরা আলোর সংবেদনকে ব্রেনে নিয়ে যায় স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে। ফলে আমরা দেখতে পাই। নার্ভের অংশটিকে চোখের ভিতর গোলাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি দেখায়। কেন্দ্রে হলুদ চারিদিকে লাল রঙের আভা।

যুবকটির অপটিক নার্ভের লাল আভা চলে গেছে। সাদা রঙের দিকে এগোচ্ছে। বাকি রেটিনা স্বাভাবিক। বিষের প্রতিক্রিয়া। মনে যে সন্দেহ হল তা জানবার জন্য প্রশ্ন করলাম।

—তুমি কি কিছু খেয়েছিলে?

যুবকটি মাথা নিচু করে আছে। বাকিরাও নির্বাক।

—না বললে তো ডায়াগনসিস্ করতে পারব না। চিকিৎসাও সম্ভব হবে না।

এবার একজন বলে,

—হ্যাঁ ডাক্তারবাবুও মদ খেয়েছিল।

অবাক হই না। এই বয়সে এই প্রবণতাই লক্ষ্য করছি।

—তুমি কি আগে মদ খেতে? মানে নেশা করতে?

—না ডাক্তারবাবু আমার কোন নেশা ছিল না। বিশ্বাস করুন বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে খেয়েছি। এর বেশি নয়। ডাক্তারবাবু আমাকে ভাল করে দিন। আর কখনও ওসব ছোঁব না কথা দিচ্ছি।

এক নিঃশ্বাসে কথা বলে আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। শেষদিকে ধরে এল ওর কণ্ঠস্বর।

—ঠিক আছে। আগে খুলে বল সেদিনের ঘটনা।

যুবকটি বলে—সন্ধ্যাবেলা চার বন্ধু মদ খাবার প্রস্তাব দিল। আমি রাজি হচ্ছিলাম না। ওরা জোর করল। শেষে বাধ্য হলাম।

—মদ কোথায় পেলে?

—আমি জানি না ডাক্তারবাবু। একজন জোগাড় করেছিল। পাঁচটা ছোট বোতল এনেছিল। খেলাম কি রকম ঝাঁঝালো লাগল। সেটা জানাতে ওরা বলে যত ঝাঁঝ হবে গলা জ্বলবে তত নেশা হবে। মনের সন্দেহ নিয়ে খাচ্ছিলাম। একটু খেয়ে ওদের চোখ এড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলাম।

—তারপর?

—ওরা সবটা খেয়ে হাসাহাসি করছিল। কিছুক্ষণ গল্প আড্ডা দিয়ে সবাই বাড়ি ফিরলাম। চুপচাপ শুয়ে খাবার সময় উঠব ভাবলাম। কিছুক্ষণ পর পেটব্যথা শুরু হল। বমি বমি ভাব। বাথরুমে যাব।

দাঁড়াতে পারছি না। ব্যালেন্স নেই। ঘরের মধ্যেই বমি করে ফেললাম। চোখে ঝাপসা দেখছিলাম। মাথা ঘুরছিল, শব্দ শুনে সবাই চলে এল। কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আর কিছু মনে নেই।

—আপনারা কি করলেন?

—ওর অবস্থা দেখে আমরা হতবাক। মদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। বুঝতে কিছুই বাকি থাকল না। সময় নষ্ট না করে হসপিটালে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। দুদিন ওখানে চিকিৎসার পর ডাক্তারবাবুরা ছুটি দিল। বলল—ভাল চোখের হাসপাতাল দেখান। আমরা প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছি।

—আর ওর বন্ধুদের কি অবস্থা?

—ওদের সকলকেই ভর্তি করতে হয়েছিল। একজন মারা গিয়েছে। তিনজনের অবস্থা ভাল নয়। চিকিৎসা চলছে নার্ভের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

—ডাক্তারবাবু আমি দেখতে চাই। পড়তে চাই। আমাকে ভাল করে দিন। চোখের কোণ দিয়ে অশ্রুবিন্দু গালের উপর গড়িয়ে এল। বুঝলাম ওর চোখের দৃষ্টিক্ষমতা হারালেও আগের মতই সংবেদনশীল।

আমার ইশারায় একজন ছেলেটিকে বাইরে নিয়ে গেল। অন্যজন জানতে চাইল

—ডাক্তারবাবু ওকি আর দেখতে পাবে না?

—বুঝতেই পারছেন কি সাংঘাতিক বিষ ওর শরীরে প্রবেশ করেছিল। সব ঠিক হয়ে গেলেও চোখের স্নায়ুর চরম ক্ষতি হয়ে গেছে। ওর দৃষ্টি কখনই স্বাভাবিক হবে না।

তোমরা ভাবছো কি হল। মদ তো অনেকেই খায়। সবাই কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ এই নেশায় আক্রান্ত। রাজা থেকে সাধারণ মানুষ সবাই খায়। তবে ওদের কি হল?

প্রশ্নটা এখানেই। ওদের কি হয়েছিল, কি খেয়েছিল, মদ না অন্য কিছু। জানতে হলে এর বৈজ্ঞানিক দিকটা ভাবতে হবে। সাধারণত রাতে মদ খাও, মস্তি হুল্লরি নাচা গানা খানা পিনা কর ঘুমিয়ে যাও সকালে উঠেই ফ্রেস। একটু হ্যাংগওভার আবার কখনও কিছুই না। নেশা কেটে গেলে ব্যস্। না সব সময় ব্যস্ হয় না। ওদের মত পরিণতি হয়।

কেন?

বিষাক্ত মদ। মদের জন্য শরীরে বিষক্রিয়া।

মিথাইল এ্যালকোহল। এটাই কিলিং এজেন্ট।

এটি এক ধরনের নিউরোটক্সিন। চোখের ভিতর বিশেষ করে ভিট্রিয়াম জেলিতে অক্সিডাইজড হয়ে ফরমিক অ্যাসিড ও ফরম্যালডিহাইড তৈরি করে। এরাই অপটিক নার্ভের কোষের ক্ষতি করে। ফলে অন্ধত্বতা দেখা দেয়।

সাধারণত মদের সঙ্গে মেথিলেটেড স্পিরিট ফর্মে এই মিথাইল এ্যালকোহল মিশিয়ে দেওয়া হয়। বেশি খেলেই পরিণতি মৃত্যু। যুবকটি অল্প খাওয়ার জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও সঙ্গে রয়ে গেল বিষের ক্ষতিচিহ্ন। অন্ধত্ব।

এক রাতের আনন্দ ওর জীবনে ডেকে আনল চির অন্ধকার।

M. 9433564719

ভড়ুই-এর ধুলো স্নান

সম্রাট সরকার

বর্ষার বৃষ্টির ফাঁকে রোদ্দুর উঠলেই আমি ক্যামেরা কাঁধে বেরিয়ে পড়ি। সেদিন আমাদের গ্রামের চাষের মাঠে যেতেই চোখে পড়ল একটি ভড়ুই বা বেঙ্গল বুশলার্ক (BENGAL BUSHLARK) আলপথের ওপর শুকনো জায়গায় শুয়ে 'ধুলো-স্নান' (DUST BATH) করছে। চট করে পাখিটাকে ঐ অবস্থায় দেখলে মনে হবে যে ও আহত অবস্থায় ছটফট করছে। যেহেতু আমি আগেও অনেক পাখিকে ধুলো-স্নান করতে দেখেছি, তাই এক্ষেত্রে ওর এই কর্মকান্ডটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। অসুবিধা যেটা হচ্ছিল ওকে বিরক্ত না করে ওর কাছাকাছি পৌঁছে যথাসম্ভব নীচু হয়ে ছবি নেওয়া। সেটা যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি।

পাখিটা যেখানে ধুলো-স্নান করছিল তার আশপাশে চাষ জমিগুলোর মধ্যে প্রচুর জমা জল বর্তমান। সেখানে অন্য পাখিদের আমি নিয়মিত স্নান করতে দেখি। আমি কিন্তু কোনো ভড়ুইকে সেই জমা জলে স্নান করতে দেখিনি। তবে তার ধুলোস্নান দেখা বেশ মজার।

ধুলোস্নানের সময় পাখিটার কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল তার শরীরের সমস্ত পালকের গোড়া পর্যন্ত ধুলো দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া। তার জন্য পাখিটার প্রধান কৌশল হল পাখনাটাকে ধুলোর মধ্যে ঘষে দ্রুত ঝাপটানো।

শরীরের প্রত্যেকটি অংশ ধুলো দিয়ে ভেজানোর জন্য তার আলাদা কৌশল জানা আছে। ঠোঁটের নীচ ও গলার জন্য সে শুয়ে পড়ে গলাটাকে ধুলোর সঙ্গে ঘষতে থাকে। মাথার ওপরের অংশের জন্য মাথাটাকে ধুলোতে ভালোভাবে ঘষে। তবে নিরাপত্তার খাতিরে মাঝেমাঝে মুখ তুলে চারপাশটা দেখতে হয় বইকি। মাঝেমাঝে তার শক্তপোক্ত পায়ের নখ দিয়ে মাটির ওপরের ধুলো খুঁড়ে আলগা করে নেয়। লেজের শেষভাগ দিয়ে ধুলো পেছনে উড়িয়ে পিঠের ওপরের পালকগুলি ভিজিয়ে নেয়।

সাধারণত নিচের কয়েকটি কারণের জন্য পাখি ধুলো-স্নান করে।

১। ধুলো-স্নান পাখিদের প্রতিদিনের পালকের রক্ষণাবেক্ষণের কাজের মধ্যে পড়ে।

২। ধুলো পালকে জমে থাকা অতিরিক্ত প্রিন অয়েল (PREEN OIL)-কে শুষে নেয়। অতিরিক্ত ধুলো আবার পালক পরিস্কার ও ঠোঁট দিয়ে আঁচড়ানোর (PREENING) সময় জমে থাকা আলগা শুকনো চামড়া এবং অন্যান্য ময়লাকে সাথে নিয়ে ঝরে পড়ে।

৩। অতিরিক্ত প্রিন অয়েল (PREEN OIL) পালক থেকে চলে গেলে পালক বেশি তৈলাক্ত হয়ে পড়ে না। পালকগুলো ওড়ার উপযোগী থাকে। এবং শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণও ভালোভাবে হয়।

৪। উকুন, মাইট (MITE) ও অন্যান্য ক্ষতিকারক পরজীবী থেকে পালকগুলো মুক্ত থাকে।

পুরো কর্মকান্ডটা ৫ থেকে ৬ মিনিট ধরে চলে। পাখি তার পছন্দসই জায়গাতে বারবার ফিরে আসে ধুলো-স্নানের জন্য। তথ্যসূত্র—Wikipedia

E-mail:samratswagata11@gmail.com • M. 9433962227

বিজ্ঞান সম্মেলন

ছবি : সৌরভ মুখার্জী

১৩ নভেম্বর, ২০১৬ বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার (কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা) উদ্যোগে রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে সারাদিন ব্যাপী এক বিজ্ঞান সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ১৩ তম সম্মেলনে 'বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকা বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারে কতটা ভূমিকা পালন করছে?' এই বিষয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রায় ২০ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। বিজ্ঞান মনস্কতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন। বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আরও বেশি করে প্রচার করা প্রয়োজন বলে বক্তারা মত বিনিময় করেন। বক্তারা অনেকেই স্মরণ করিয়ে দেন যে মাটির সাথে সংযোগ ও অমায়িকতা বজায় রাখার এবং মানুষের সাথে মানুষের সহজ সরল অনাড়ম্বর বৈজ্ঞানিক জীবন যাপনের কথা।

২য় পর্যায়ে পঃ বঙ্গের যমুনা নদীর দূষণ ও বিপদ নিয়ে আলোকচিত্রসহ বক্তব্য রাখেন অনুপ হালদার, এবং গণমাধ্যমে পরিবেশ চর্চার নানা দিক নিয়ে আলোকচিত্রসহ আলোচনা করেন পরিবেশকর্মী তথা ইতিহাসের শিক্ষক মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়। প্রকৃতি পাঠের মধ্য দিয়ে মথুরাবিল পর্যবেক্ষণ করা হয়। আলোচনায় রাজ্যস্তরে বিজ্ঞান আন্দোলন কিভাবে আরো বিস্তার লাভ করা যায় সে নিয়ে বিভিন্ন সংস্থার সদস্যদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হয়। আশু কর্মসূচি বিষয়ে জলাভূমি ভরাট ও গাছ কাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন, শব্দবাজি ও ডি. জে. উৎপাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন পাশাপাশি বিজ্ঞান চেতনার প্রচার ও প্রসার ও পরিবেশ সচেতনতা প্রসারের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়।

শব্দবাজির বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান ঃ অক্টোবর মাসব্যাপী বিজ্ঞান দরবারের কর্মীরা শব্দবাজির বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালায়। স্থানীয় কল্যাণী, কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, গয়েশপুর পৌরসভায় শব্দবাজি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বইমেলায় অংশগ্রহণ ঃ ৩ ডিসেম্বর - ১২ ডিসেম্বর কল্যাণী বইমেলায় বিজ্ঞান দরবার সংস্থার পক্ষ থেকে বিজ্ঞানের বই পত্র-পত্রিকা সহ অংশগ্রহণ করা হয়।

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মীরা চাকদহ বইমেলায় বিজ্ঞানের বই পত্র-পত্রিকা সহ স্টলে অংশগ্রহণ করে।

সাপ নিয়ে সচেতনতা ঃ ২৮ ডিসেম্বর আনন্দপুর হাইস্কুলের এন.এস.এস. ক্যাম্পের অনুষ্ঠানে চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মীরা সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে এক সচেতনতা

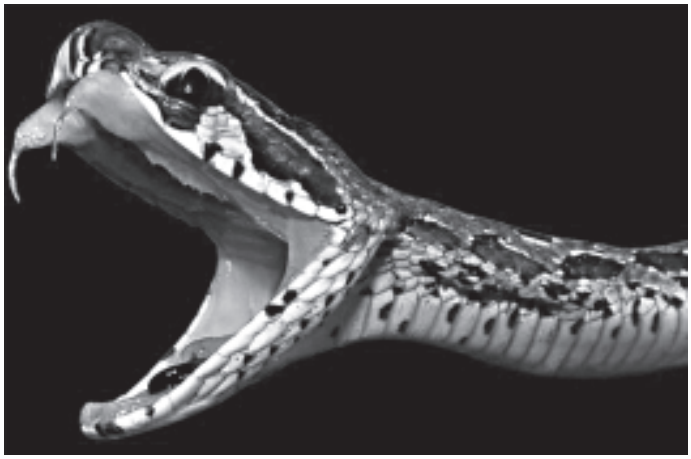

চন্দ্রবোড়া

প্রসার কর্মসূচি পালন করে। আলোকচিত্রের সাহায্যে সাপ সম্পর্কে নানান তথ্য সহ আলোচনা করেন বিবর্তন ভট্টাচার্য ও অভিজিৎ অধিকারী। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান দরবারের পক্ষ থেকে জয়দেব দে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন ও বিজ্ঞানের বই পত্র-পত্রিকা প্রচার করেন।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির ঃ ২৫ ডিসেম্বর - ২৯ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি সংয়েন্স এন্ড নেচার ক্লাবের পরিচালনায় জলপাইগুড়ি জেলার পোখরি ও সামসিং অঞ্চলে ৪ দিন ব্যাপী এক প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান চেতনা, পরিবেশ রক্ষা, জঙ্গলকে চেনা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে ৪ দিনের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা, পরিবেশকে চেনা, হাতে কলমে খাদ্যে ভেজাল কিভাবে ধরবেন বিজ্ঞানের বই-পত্রিকা সহ নানা উপকরণ নিয়ে ৫ দিনের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবিরে কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার ও চাকদহ বিজ্ঞান ও

সাংস্কৃতিক সংস্থায় কর্মীরা অংশগ্রহণ করে। জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশ রক্ষার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

অলৌকিক নয়, আছে বিজ্ঞান

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আগুনের উপর হাঁটা ঃ আগুনকে ভয় পায় না এমন কোনো প্রাণী পৃথিবীতে আছে বলে জানা নেই। অথচ বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেখা যায় কিছু সন্ন্যাস ও ভক্তের দল গনগনে আগুনের উপর দিব্যি নির্ভয়ে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। আগুন তাঁদের স্পর্শও করছে না। এ রকম অকল্পনীয় ঘটনা দেখে সাধারণ মানুষ সহজেই বিশ্বাস করে নেয় যে যোগী ঋষিরা নিশ্চয়ই দেবতার আশীর্বাদধন্য ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। শুধু ভারতবর্ষেই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ধরনের অলৌকিক কান্ডকারখানা দেখানোর প্রবণতা আছে। বুলগেরিয়ার বার্গাসবন্দরের কাছে প্রতি বছর ৩ জুন এরকম একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা শোনা যায়। এক সময় ভারতের খোদাবক্স ও আহমেদ হোসেন আগুনের উপর হেঁটে সারা পৃথিবীতে হৈ চৈ ফেলে দেয়। ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন কাউন্সিল ফর সাইকিকাল ইনভেস্টিগেশন্স নামে লন্ডনের একটি সংস্থা এঁদের আগুনের উপর হাঁটা নিয়ে গবেষণা চালায়। এই ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য একটি আয়তকার নিচু জমি ঠিক করা হয়। সেটিকে কাঠকয়লা দিয়ে ভর্তি করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কাঠকয়লাগুলি জ্বলে জায়গাটি যখন গনগনে আগুনে ভর্তি হয়ে যায় তখন সেটা একটা জ্বলন্ত উনুনের আকার ধারণ করে। যার তাপমাত্রা কয়েকশো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সাধারণ মানুষের পক্ষে এর উপর দিয়ে হাঁটা অসম্ভব হলেও খোদাবক্স বা আহমেদ হোসেনের কোনো অসুবিধা হয়নি।

বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে এই সব ঘটনার পিছনে কোনো অলৌকিকতা নেই। আসল রহস্য জানা থাকলে অভ্যাসের দ্বারা আপনি, আমি এই খেলা দেখাতে পারি। এখন দেখা যাক ব্যাপারটার পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি কী?

আগুনের উপর কোনো জলের পাত্র বসালেই যেমন সঙ্গে সঙ্গে জল ফোটে না—তার জন্য দরকার নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, তেমনি শরীরের কোনো অংশ আগুনের সংস্পর্শে এলেই সেখানে ফোস্কা পড়ে না বা পুড়ে যায় না। এর জন্যও দরকার বিশেষ তাপমাত্রা। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। আগুনের উপর দিয়ে যারা হাটেন তারা এত দ্রুত গতিতে হাটেন যে পায়ের পাতা আগুনের সংস্পর্শে মাত্র কয়েক সেকেন্ড থাকে। এতে পায়ের পাতার তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি বাড়ে না। এছাড়াও বহুদিনের অভ্যাসের ফলে এদের পায়ের পাতার চামড়া মোটা হয়ে যায়। ফলে তাপ সহ্য করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। আগুনের উপর হাঁটার খেলাগুলি বেশিরভাগ সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হওয়ায় যারা খেলা দেখান তারা সাধারণত স্নান করে ভিজে পায়ে এবং ভিজে কাপড়ে আগুনের উপর হাঁটেন। এর ফলে ভিজে পা ও ভিজে কাপড় থেকে চুঁইয়ে পড়া জল পায়ের পাতার আগুনের তাপ কমাতে সাহায্য করে। এছাড়াও ঘৃতকুমারীর ডাঁটার রস পায়ে মেখে নিলে অথবা ফটকিরি মেশানো জলে পা ধুয়ে তাতে সাবান মাখিয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নিলে আগুনের উপর দিয়ে হাঁটার সময় পায়ে সাময়িক ভাবে তাপ লাগবে না।

E-mail : kbb.scwriter@gmail.com • M. 9433145112

সৌরকলঙ্ক

রতন দেবনাথ

সূর্য হল সৌরজগতের মূল কেন্দ্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে অবিরাম ঘুরে চলেছে গ্রহগুলি। দিনের আকাশে যে সূর্যকে আমরা দেখি সেটিই সূর্যের সবটা নয়। এটি সূর্যের মধ্যের একটি অংশ মাত্র। সূর্যের প্রচন্ড আলো এবং তাপের উৎস এটিই। সূর্যের দেহভরের অধিকাংশই এখানে স্তূপীকৃত। এই অংশটির নাম আলোকমন্ডল। আলোকমন্ডলের বাইরেও রয়েছে সূর্যদেহের অংশ যা সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না। পূর্ণ গ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় অথবা অন্য সময়ে বিশেষ ব্যবস্থায় সেই অংশটি দেখা যায়। আলোকমন্ডলকে ঘিরে তার চারপাশে রয়েছে আরও কয়েকটি স্তর যাদের বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়েছে সুদূর গ্রহান্তরে। আলোকমন্ডলকে ঘিরে থাকা সূর্যের এই অংশের সাধারণ নাম 'সৌর বায়ুমন্ডল'।

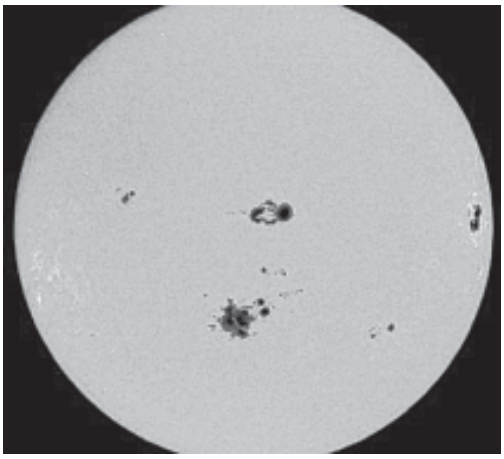

সূর্যের উজ্জ্বল আলোকমন্ডলের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় নানা আকৃতির কালো কালো দাগ। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'সৌরকলঙ্ক'। ১৬১০ সালে ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি দূরবীণ-এর সাহায্যে সর্বপ্রথম লক্ষ করেন সৌরকলঙ্ক। প্রাচীন চীন দেশেও জানা গিয়েছিল সৌরকলঙ্কের কথা। সে সময় সৌরকলঙ্কের স্বরূপ নিয়ে বিদ্বজ্জনের মধ্যে তর্কযুদ্ধও কম হয়নি। সৌরপৃষ্ঠে কালো কালো দাগগুলিকে আবার গ্রহের তকমাও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গ্যালিলিওই প্রথম সাব্যস্ত করলেন ওগুলি সূর্যদেহের এই অংশ, নতুন কোন গ্রহ নয়। সে সময় সৌরকলঙ্ক নিয়ে বেশ সোরগোল হলেও গ্যালিলিও পরবর্তীকালে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা যথেষ্ট কমে যাওয়ায় তা নিয়ে চর্চার অবকাশও কমে যায়। পরবর্তীকালে সৌরকলঙ্কের পুনরাবির্ভাবে তা নিয়ে আবার চর্চা শুরু হয়।

সৌরকলঙ্কগুলি নানা আকৃতির হয়ে থাকে। আবার একই কলঙ্কের আকৃতি সময়ের অবকাশে পরিবর্তিত হতেও দেখা যায়। তবে মোটামুটিভাবে সৌরকলঙ্কের আকার গোল বলেই ধরা হয়। এক একটি কলঙ্কের ব্যাস প্রায় ৫০০০০ কিলোমিটার পর্যন্তও হতে পারে। আলোকমন্ডলের তাপমাত্রা প্রায় ৫৮০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলোকমন্ডলের অন্যান্য অংশের নিরিখে সৌরকলঙ্কের তাপমাত্রা কম বলে আলোকমন্ডলের ওই অংশগুলো কালো দেখায়। কলঙ্কগুলো সাধারণত সৌরপৃষ্ঠে জোটবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়, তবে জোটহীন কলঙ্কও অসম্ভব নয়। সব কলঙ্কের আয়ুষ্কালও সমান নয়। কোন কোনটির আয়ুষ্কাল মাত্র কয়েক ঘন্টা, কতকগুলোর কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ। আবার কোন কোন কলঙ্ক তিন-চার মাস কালব্যাপীও দৃষ্ট হতে পারে।

সৌরপৃষ্ঠে একটি দীর্ঘায়ু কলঙ্কের অবস্থান যদি লক্ষ করা যায় তবে দেখা যাবে সেটি ধীরে ধীরে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। আবার কিছুদিন পর সেগুলির পূর্বদিকে পুনরাবির্ভাব লক্ষ করা যায়।

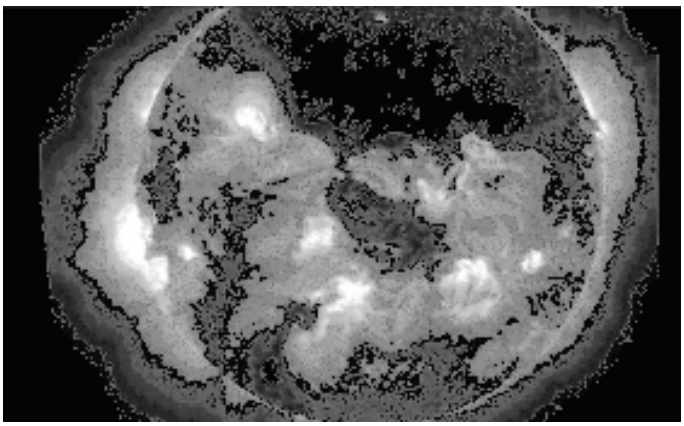

উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর বিস্তৃত অক্ষের চারপাশে সূর্যের নিজস্ব ঘূর্ণনের জন্যই সৌরকলঙ্কের এরূপ অবস্থান পরিবর্তন।

সৌরপৃষ্ঠে কলঙ্কের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি এক রহস্যময় ব্যাপার। কলঙ্কের সংখ্যা কোন কোন সময় দ্রুত বেড়ে গিয়ে একটি সর্বোচ্চ সংখ্যায় পৌঁছায়, আবার পরবর্তী সময়ে সেই সংখ্যা কমতে কমতে দেখা যায় প্রায় শূন্য। বেশ কিছুদিন সূর্য থাকে কলঙ্কমুক্ত। আবার সূর্য হতে থাকে কলঙ্কিত। দেখা গেছে, কলঙ্ক সংখ্যার সর্বাধিক বৃদ্ধি বা সর্বাধিক হ্রাস ঘটে প্রায় ১১ বছরের ব্যবধানে।

সৌরকলঙ্ক সৃষ্টির সম্ভাব্য কারণ হিসাবে সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রকেই ধরা হয়। সৌরপৃষ্ঠে যেখানে কলঙ্কের সৃষ্টি হয় সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পরিচালন প্রবাহকে বাধা দেয়। ফলে সেই জায়গাগুলোর তাপমাত্রা কিছুটা কমে যায়। তাই সেই জায়গাগুলো কালো দেখায়। এছাড়া সূর্যের নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ প্রায় ১১ বছরের ব্যবধানে পাল্টে যায়। ফলে সৌরকলঙ্কের সর্বাধিক হ্রাস-বৃদ্ধি ১১ বছরের সময় কালের চক্রে আবর্তিত হয়। সেদিক থেকে বলা যায় সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রেরই ফলশ্রুতি।

E-mail : rdebnath1961@gmail.com • M. 9477934928

ADMISSION OPEN

Session : 2017-18

Kanchrapara Albatross School

Play group to class-viii
digi school
new building
Ph. 8013191616
03325856660

যেকোন উৎসব অনুষ্ঠানে সু-স্বাদু আহার
পরিবেশনায় আমাদের একমাত্র লক্ষ্য

সাইমুনিয়া ডেকরেটার্স
এন্ড ক্যাটারার

যোগাযোগ ঃ বিজয় ও অঙ্কুর
M. 7685992766 / 8981702615
রামকৃষ্ণ কলোনী, মাঝিপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

Delux
Let's colour

NEROLAC
HEALTHY HOME PAINTS

Authorised Dealer :

SUBINOY PAUL

M. 9231545191
Workshop Road : Kanchrapara, North 24 Pgs.

সৌজন্যে :

BUNTI TRADERS
&
ORDER SUPPLIERS

Halisahar, Khasbati, North 24 Parganas

ALL PAINTS DEALER

জানো কি?

বিজয় সরকার

❑ ঘুমানোর সময় চোখ বন্ধ রাখা কি জরুরী?

দিনের শেষে আমরা বালিশে মাথাটি রেখে চোখ দুটি বন্ধ করে ফেলি, অপেক্ষা করি একটা গভীর ঘুমের। কিন্তু চোখ দুটি কেন বন্ধ করি? ঘুমানোর জন্য এটি কি জরুরী?

বেশিরভাগ প্রাণীর ক্ষেত্রেই ঘুমানোর সময় চোখ বন্ধ রাখার প্রয়োজন হয়। এর পেছনে বিভিন্ন কারণ আছে। যেমন— চোখ বন্ধ রাখলে বাইরের কোন বস্তু চোখে ঢুকতে পারে না। আমাদের চোখ সবসময় ভিজে থাকে। সারারাত চোখ খোলা রাখলে আর্দ্রতা হারিয়ে চোখ দুটি শুকিয়ে যেতে পারে। আর একটি কারণ হল, চোখ দুটি বন্ধ রাখলে চোখের পেশিগুলি ভালভাবে বিশ্রাম পায়। ব্যস, চোখ বোজ আর ঘুমাও।

❑ ঘোড়া কেন দাঁড়িয়ে ঘুমোয়?

দাঁড়িয়ে ঘুমোতে বললে তোমার কেমন লাগবে? নিশ্চয় স্বস্তি বোধ করবে না। কিন্তু ঘোড়ার ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীতটাই ঘটে। কি করে এটা সম্ভব হয়? এর কারণ ঘোড়ার বিশেষ ধরনের বডি-ডিজাইন।

ঘোড়ার পায়ে টেন্‌ডন্ (যে তন্তুগুলি পেশিকে হাড়ের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে) ও লিগামেন্ট (যে কলাসমূহ একাধিক অস্থিকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখে) এর এমন এক বিশেষ সমন্বয়মূলক ব্যবস্থা আছে যা ঘোড়ার পাগুলিকে নট্ নড়ন-চড়ন অবস্থায় রাখতে সাহায্য করে। ফলে পায়ের পেশিগুলি বিশ্রাম পায় এবং ঘোড়ার দাঁড়িয়ে ঘুমোতে কোন অসুবিধা হয় না। তবে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে অভ্যস্ত হলেও ঘোড়া মাঝে মধ্যে মাটিতে শুয়েও ঘুমোয় ও বিশ্রাম নেয়।

❑ পিঁপড়ে কি ঘুমোয়?

হ্যাঁ, পিঁপড়ে ঘুমোয়। কিন্তু তাদের ঘুম অন্যান্য প্রাণীদের থেকে একটু অন্যরকম। এরা টানা অনেকক্ষণ না ঘুমিয়ে বারে বারে ছোট ছোট ঘুম দেয়। পিঁপড়েদের কলোনি তৈরি হয় শ্রমিক ও রাণী পিঁপড়ে নিয়ে। রাণী পিঁপড়ে কিন্তু গভীর ও লম্বা ঘুম দেয়। মোটামুটিভাবে দিনে ন' ঘন্টা। আর শ্রমিক পিঁপড়ে ঘুমোয় এর অর্ধেক সময় এবং তা দিনের মধ্যে কয়েকশো ছোট ছোট ঘুম। এর কারণ হল কলোনির সুরক্ষা ও পরিচর্যার দিকে তারা সব সময় সজাগ থাকে। লম্বা ঘুমে তা কি করে সম্ভব?

❑ রেল লাইনের ধারে পাথরের টুকরো কেন থাকে?

ছোট ছোট পাথরের টুকরো রেল লাইনের দু'পাশে ও মাঝে সাজান থাকে। এই পাথরগুলিকে বলা হয় ব্যালাস্ট। ট্রেন যখন রেল লাইনের ওপর দিয়ে যায়, তখন পাথরগুলি লাইনকে ঠিক জায়গায় ধরে রাখে, পাশে সরতে দেয় না। পাথর থাকার ফলে লাইনে বৃষ্টির জল জমে থাকে না, পাথরের ফাঁক দিয়ে জল সহজেই বেরিয়ে যায়। এছাড়া রেল লাইনে আগাছা জন্মে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটাতে পারে, কিন্তু পাথর থাকার ফলে আগাছার বাড়-বাড়ন্ত কম হয়। পাথর রেল লাইনের ভারও বহন করে থাকে। অর্থাৎ ছোট ছোট পাথরও কত উপকারী!

সত্যি কথা

জগন্ময় মজুমদার

এক সত্যি

সত্যি কথা বলতে মানা তবুও বলি শোনো
যায় না সাপ কোনো দিনও পোষ মানানো
দুধ কলা সাপ খায় না মোটে
যা রটে সব মিথ্যে বটে
গল্পে বোনা এসব কথা সব বানানো।

দুই সত্যি

সূর্য ওঠেন সকাল বেলা ঘোরেন সারাদিন
এসব কিন্তু মিথ্যে কথা এবং মূল্যহীন
পৃথিবীটাই ঘুরছে কেবল সূর্যটাকে ঘিরে
অন্য গ্রহ তারাও আছে ঘুরছে ফিরে ফিরে
সবাই প্রথম ভুল ভেবেছে শুনলো যেদিন।

তিন সত্যি

শ্যাওড়া গাছে ভূত থাকে না ভূতের বাড়ি দূরে
অনেক খুঁজেও পাইনি তাকে এই পৃথিবী ঢুঁড়ে
ভূতের নেইকো ভবিষ্যত
ভূতের নেইকো আলোপথ
আলো দেখেই পালায় সে যে অন্ধকারপুরে।

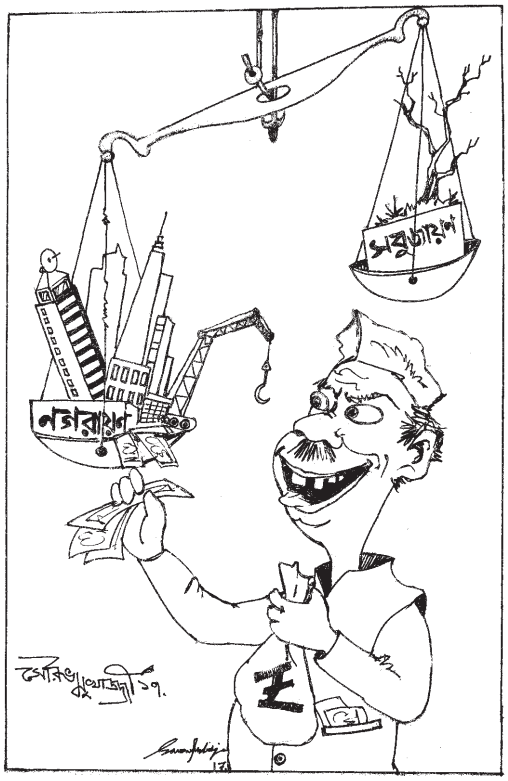

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সর্দার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস, বিবর্তন ভট্টাচার্য

E-mail : bijnandarbar1980@gmail.com / ganabijnan@yahoo.co.in